بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৮ জানুয়ারি, ২০২২ মোতাবেক ২৮ সুলাহ্, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল আজও তা অব্যাহত থাকবে। হামরাউল আসাদ-এর যুদ্ধ সম্পর্কে লেখা আছে, মহানবী (সা.) শনিবারে উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, রবিবার যখন ঊষার উদয় হয় হযরত বেলাল (রা.) আযান দেন এবং বসে বসে মহানবী (সা.)-এর (বাড়ির) বাইরে আসার অপেক্ষা করতে থাকেন। এ সময় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বিন অওফ মুযনী মহানবী (সা.)-এর সন্ধানে আসেন। মহানবী (সা.) বাইরে বেরিয়ে এলে তিনি দাঁড়িয়ে তাঁকে (সা.) সংবাদ দেন যে, তিনি তার পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে আসছিলেন আর যখন মালাল এ পৌঁছেন সেখানে কুরাইশদের শিবির দেখতে পান। মালাল মদীনা থেকে ২৮ মাইল দূরে মক্কার পথে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। তিনি আবু সুফিয়ান এবং তার সাথীদের একথা বলতে শুনেছেন যে, তোমরা তেমন কিছুই করো নি। তোমরা মুসলমানদের ক্ষতি করেছ এবং তাদের কষ্ট দিয়েছ ঠিকই কিন্তু তোমরা তাদেরকে ধ্বংস না করেই ছেড়ে দিয়েছ। কাফিররা বলে, তাদের মাঝে এমন অনেক বড় বড় লোক রয়ে গেছে, বা বেঁচে আছে যারা তোমাদের মোকাবিলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে। তাই ফিরে চলো যাতে আমরা তাদের মধ্যে জীবিত লোকদেরকে নির্মূল করতে পারি। সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা তাদেরকে একাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, সে কাফিরদের মাঝেই বসে ছিল আর তাদের বাঁধা দিয়ে বলে, হে আমার জাতি! এমনটি করো না। কেননা, তারা ইতোমধ্যে যুদ্ধ করে ফেলেছে আর আমার আশংকা হয় যে, তাদের মাঝে যারা যুদ্ধে আসতে পারে নি তারাও এখন তোমাদের মোকাবিলা করার জন্য তাদের সাথে যোগ দিবে। তোমরা ফিরে চলো, কেননা বিজয় তো তোমাদেরই হয়েছে। আমার ভয় হয় যে, তোমরা পুনরায় গেলে পরাজিত হবে। এসব কথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-কে ডাকেন এবং তাদেরকে এই মুযনী সাহাবীর বক্তব্য শোনান। তারা উভয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! শত্রুদের উদ্দেশ্যে চলুন, যাতে তারা আবার আমাদের সন্তানদের ওপর আক্রমন করতে না পারে। মহানবী (সা.) ফজরের নামাযের পর লোকদেরকে ডেকে পাঠান এবং তিনি (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে এমর্মে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দেন যে, মহানবী (সা.) তোমাদেরকে শত্রুর মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর (বলছেন) আমাদের সাথে যেন কেবল তারাই বের হয় যারা গতকাল উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। মহানবী (সা.) নিজের পতাকা আনান যা গতকাল থেকে বাঁধা ছিল আর যা তখনও খোলা হয় নি। মহানবী (সা.) এই পতাকা হযরত আলী (রা.)'র হাতে তুলে দেন, আর এটিও বলা হয় যে, হযরত আবু বকর (রা.)-কে দিয়েছিলেন। যাহোক, মুসলমানদের এই কাফেলা যখন মদীনার ৮ মাইল দূরে

হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছে তখন মুশরিকরা ভয় পেয়ে যায় আর তারা মদীনায় আবার আক্রমন করার অভিসন্ধি পরিত্যাগ করে মক্কায় ফেরত চলে যায়।

বনু-নযীর-এর যুদ্ধ হয়েছিল ৪র্থ হিজরীতে। মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি ছোট্ট দল নিয়ে বনু নযীর (গোত্রের) বসতিস্থলে যান। তিনি (সা.)-এর সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। যেমন, একটি রেওয়াতে অনুসারে মহানবী (সা.) তাদের কাছে বনু আমর গোত্রের দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করতে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথে প্রায় ১০জন সাহাবী ছিলেন। তাদের মাঝে হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন। মহানবী (সা.) সেখানে গিয়ে তাদের সাথে সেই অর্থের কথা বলেন। তখন ইহুদীরা বলে, হ্যাঁ! (ঠিক আছে) হে আবুল কাশেম! আপনি প্রথমে খাবার খেয়ে নিন, এরপর আপনার কাজ করে দিব। তখন মহানবী (সা.) একটি দেয়ালের পাশে বসে ছিলেন। ইহুদীরা পরস্পর ষড়যন্ত্র করে আর বলে, এই ব্যক্তি অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার জন্য এরচেয়ে মোক্ষম সুযোগ তোমরা আর পাবে না। এজন্য বল, কে এই বাড়ির ছাদে উঠে একটি বড় পাথর তাঁর ওপর ফেলবে যাতে আমরা তাঁর হাত থেকে নিস্কৃতি পাই। একথা শুনে ইহুদীদের এক নেতা আমর বিন জাহাশ সম্মত হয় এবং বলে, এ কাজ করার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তখন সালাম বিন মিশকাম নামের আরেকজন ইহুদী নেতা এ কাজের বিরোধিতা করে বলে, একাজ কখনো করো না। খোদার কসম! তোমরা যা কিছু চিন্তা করছ এর সংবাদ তিনি অবশ্যই পেয়ে যাবেন। এটি চুক্তিভঙ্গের নামান্তর কেননা, আমাদের ও তাঁদের মাঝে চুক্তি রয়েছে। এরপর পাথর ফেলতে সম্মত ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর ওপর পাথর ফেলার জন্য যখন ওপরে যায় তখন ঊর্ধ্বলোক থেকে মহানবী (সা.)-এর কাছে এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ আসে, অর্থাৎ ইহুদীরা কী করতে চাচ্ছে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। তিনি (সা.) তাৎক্ষণাৎ তাঁর বসার স্থান থেকে উঠে পড়েন এবং নিজ সঙ্গীদের সেখানেই বসা অবস্থায় রেখে এমনভাবে ফিরে আসেন যেন তাঁর কোন কাজ রয়েছে। মহানবী (সা.) দ্রুতগতিতে মদীনায় ফিরে যান। তিনি (সা.) মদীনায় পৌঁছার পর হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে বনু নযীরের কাছে এই বার্তাসহ প্রেরণ করেন যে, আমার শহর, অর্থাৎ মদীনা থেকে বেরিয়ে যাও, তোমরা এখন আর আমার শহরে থাকতে পারবে না। তোমরা যে ষড়যন্ত্র করেছ তা ছিল বিশ্বাসঘাতকতা। মহানবী (সা.) ইহুদীদেরকে ১০দিন সময় দেন কিন্তু তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানায় আর বলে, আমরা আমাদের আবাসস্থল ছেড়ে কখনোই যাব না। এই সংবাদ শোনার পর মুসলমানরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। সব মুসলমান একত্রিত হয়ে গেলে মহানবী (সা.) বনু নযীরের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হন। যুদ্ধের পতাকা হযরত আলী (রা.) বহন করেন। মহানবী (সা.) তাদের দুর্গ অবরোধ করেন, কিন্তু তাদের সাহায্যের জন্য কেউই এগিয়ে আসে নি। মহানবী (সা.) বনু নযীরের বিরুদ্ধে সেনাভিযানের পর এশার সময় তাঁর ১০জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে আসেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তখন তিনি (সা.) ইসলামী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব হযরত আলী (রা.)'র হাতে অর্পণ করেন, কিন্তু আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে এই সৌভাগ্য হযরত আবু বকর (রা.) লাভ করেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে কঠোরভাবে অবরোধ করে রাখেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের, অর্থাৎ ইহুদীদের হৃদয়ে মুসলমানদের ত্রাস সঞ্চার করেন। অবশেষে তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে এমর্মে আবেদন করে যে, তাদেরকে যেন অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া এমন সব জিনিস নিয়ে দেশান্তরিত হওয়ার অনুমতি দেয়া হয় যা উটের পিঠে তুলে

নেয়া সম্ভব এবং যেন প্রাণও ভিক্ষা দেয়া হয়। মহানবী (সা.) তাদের এই শর্ত ও আবেদন মঞ্জুর করেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) ১৫দিন পর্যন্ত (তাদের দুর্গ) অবরোধ করে রাখেন। অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়েতে দিনের সংখ্যায় ভিন্নতা দেখা যায়। মহানবী (সা.) আনসারদের সম্মতি নিয়ে বনু নযীরের যুদ্ধে লব্ধ সম্পদের পুরোটাই মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আনসারদের দল! আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

বদর আল্ মওএদ-এর যুদ্ধ। এটি ৪র্থ হিজরী সনের ঘটনা। এই যুদ্ধের কারণ হল, আবু সুফিয়ান বিন হার্‌ব উহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বলে, আগামী বছর আমাদের ও তোমাদের সাক্ষাৎ হবে বদরুস্ সাফরায়। আমরা সেখানে যুদ্ধ করব। মহানবী (সা.) হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে বলেন, তাকে বলে দাও ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ্। এ অঙ্গীকার করে লোকেরা পৃথক হয়ে যায়। কুরাইশরা ফিরে আসে আর মু'মিনরা তাদের লোকদেরকে এই অঙ্গীকার সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। বদর হল, মক্কা ও মদীনার মাঝে বিদ্যমান একটি বিখ্যাত কূঁপ যা সাফরা উপত্যকা ও জার নামক স্থানের মাঝখানে অবস্থিত। বদর মদীনা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ১৫০ কি: মি: দূরত্বে অবস্থিত। অজ্ঞতার যুগে এই জায়গায় প্রতি বছর ১লা যিলকদ থেকে ৮ দিবসীয় একটি বিরাট মেলা বসত। যাহোক, অঙ্গীকারের সময় যতই ঘনিয়ে আসছিল আবু সুফিয়ান ততই মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা অপছন্দ করছিল। তার মাঝে ভীতি সঞ্চার হচ্ছিল। সে আকাঙ্খা করছিল, এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেন মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ না হয়। আবু সুফিয়ান ভাবটা এমন দেখাচ্ছিল যে, সে একটি বড় সেনাবাহিনী নিয়ে মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত মদীনাবাসীদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দেয়া যে, সে অনেক বড় একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করছে এবং আরবের প্রান্তে প্রান্তে এই সংবাদ ছড়িয়ে দেয়া, যাতে এর দ্বারা মুসলমানদেরকে ভীত করা যায়। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)ও মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ধর্মকে বিজয়ী করবেন, তাঁর নবী (সা.)-কে সম্মান দান করবেন। আমরা আমাদের জাতির সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম আর আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা পছন্দ করি না। কাফিররা একে ভীরুতা মনে করবে। অঙ্গীকার অনুসারে আপনি চলুন! আল্লাহ্‌র কসম! এতে অবশ্যই কল্যাণ নিহিত আছে। এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তব্য শুনে মহানবী (সা.) অনেক আনন্দিত হন। মহানবী (সা.) যখন এ সম্পর্কে অর্থাৎ, আবু সুফিয়ান প্রমুখের সৈন্যদল প্রস্তুত করা সম্পর্কে (সংবাদ পান) তখন তিনি (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে নিজের অবর্তমানে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। অপর একটি রেওয়ায়েত অনুসারে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সুলুলকে আমীর নিযুক্ত করেন এবং নিজের পতাকা হযরত আলী (রা.)'র হাতে তুলে দেন আর এরপর মুসলমানদের সাথে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মহানবী (সা.)-এর সাথে ১৫শ মুসলমান ছিল। মুসলমানরা বদরের প্রান্তরে বসা মেলাতে ক্রয়বিক্রয় করে আর ব্যবসায় অনেক মুনাফা করে। ৮দিন অবস্থানের পর (তারা) মদীনায় ফিরে আসেন। যে মেলা বসেছিল সেখানে মুসলমানরা ব্যবসাবাণিজ্যও করে। যুদ্ধ হলে তো হবেই আর যদি না হয় তাহলে সেখানে যেন কমপক্ষে ব্যবসা হয়ে যায় আর এর ফলে মুসলমানদের অনেক লাভ হয়েছে। পুনরায় লিখেন, উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের পুনরায় মোকাবিলার যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল

এ–সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ রয়েছে আর বিবরণটি লিখেছেন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)। তিনি লিখেন,

উহুদের যুদ্ধের পর রণক্ষেত্র থেকে ফিরে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান মুসলমানদের এ চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে, আগামী বছর বদরের প্রান্তরে আমাদের ও তোমাদের মাঝে যুদ্ধ হবে। মহানবী (সা.) এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এজন্য পরবর্তী বছর, অর্থাৎ ৪র্থ হিজরী সনের শওয়াল মাস শেষ হওয়ার উপক্রম হলে মহানবী (সা.) দেড় হাজার সাহাবীর একটি দল সাথে নিয়ে মদীনা থেকে বের হন এবং নিজের অবর্তমানে আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে আমীর নিযুক্ত করেন। অপরদিকে আবু সুফিয়ান বিন হার্‌ব ২ হাজার কুরাইশের সেনাদল নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়। কিন্তু উহুদের জয় এবং এত বড় দল সাথে থাকা সত্ত্বেও তার অন্তর ভীত ছিল। এছাড়া ইসলামকে ধ্বংসের প্রবল বাসনা থাকা সত্ত্বেও অনেক বড় দল গঠিন না হওয়া পর্যন্ত সে মুসলমানদের মুখোমুখি হতে চাচ্ছিল না। অতএব, সে মক্কাতে থাকা অবস্থায় নুয়ায়েম নিরপেক্ষ গোত্রের এক সদস্যকে মদীনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে আর তাকে তাগাদা দিয়ে বলে, যে করেই হোক; ভয়ভীতি প্রদর্শন বা সত্যমিথ্যা বলে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে মুসলমানদেরকে যেন বিরত রাখে।

যাহোক, সেই ব্যক্তি মদিনায় আসে এবং কুরাইশদের রণ-প্রস্তুতি এবং শক্তি ও উৎসাহ উদ্দীপনার মিথ্যা কাহিনি শুনিয়ে শুনিয়ে মদীনায় এক অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলে। এমনকি কতিপয় দুর্বল প্রকৃতির মানুষ এই যুদ্ধে যোগদান করতেও ভয় পেতে থাকে কিন্তু মহানবী (সা.) যখন বের হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন এবং তিনি (সা.) তাঁর ভাষণে বলেন, আমরা কাফিরদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এই সময়ে বের হওয়ার অঙ্গীকার করেছি। কাজেই, আমরা এ থেকে পিছপা হতে পারি না। আমাকে যদি একাও যেতে হয় আমি যাব এবং শত্রুর মোকাবিলায় বুকপেতে দণ্ডায়মান থাকব। একথা শুনে মানুষের মন থেকে ভয় দূর হতে থাকে এবং তারা অত্যন্ত উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সাথে মহানবী (সা.)-এর সাথে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

যাহোক, মহানবী (সা.) দেড় হাজার সাহাবী নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন আর অন্যদিকে আবু সুফিয়ান দুই হাজার সিপাহী সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়। কিন্তু ঐশী হস্তক্ষেপ যা ঘটল তা হল, মুসলমানেরা নিজেদের অঙ্গীকার অনুযায়ী বদর প্রান্তরে পৌঁছে গেল ঠিকই কিন্তু কুরাইশদের সেনাদল কিছুদূর এগিয়ে এসে আবার মক্কায় ফিরে যায়। ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছে তা হল, আবু সুফিয়ান যখন নুয়ায়েমের ব্যর্থতার কথা জানতে পারে তখন সে ভেতরে ভেতরে ভয় পায় এবং তার সেনাবাহিনীকে এ বলে ফিরিয়ে নিয়ে যায় যে, এবছর চরম দুর্ভিক্ষ চলছে আর মানুষও অভাবগ্রস্ত তাই এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এলে অধিক প্রস্তুতির নিয়ে মদীনায় আক্রমণ করব। ইসলামী সেনাবাহিনী আট দিন পর্যন্ত বদর প্রান্তরে অবস্থান করে আর সেখানে যেহেতু প্রতিবছর জিলকদ মাসের প্রারম্ভে মেলা বসতো (যার উল্লেখ আগেও করা হয়েছে) তাই এই দিনগুলোতে সাহাবীদের অনেকেই এই মেলায় ব্যবসা করে বেশ ভালো মুনাফা অর্জন করে। এমনকি তারা তাদের এই আটদিনের ব্যবসায় তাদের মূলধন দ্বিগুণ করে নেয়। যখন মেলা শেষ হল অথচ কুরাইশ বাহিনী আসলো না তখন মহানবী (সা.) বদর প্রান্তর থেকে যাত্রা করে মদীনায় ফেরত চলে আসেন। আর এদিকে কুরাইশরা মক্কায় ফিরে মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। এই যুদ্ধকে **গযওয়ায়ে বদর আল্ মওএদ বলে**।

বনু মুস্তালিক নামে একটি যুদ্ধ হয় পঞ্চম হিজরী সনের শাবান মাসে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, **বনু মুস্তালিক যুদ্ধের অপর নাম মুর-ইয়াসী'র যুদ্ধ**। বনু মুস্তালিক খুযাআর একটি শাখা-গোত্র। এই গোত্রটি একটি কূপের পাশে বসবাস করতো যেটিকে মুর-ইয়াসী' বলা হতো। এটি ফুরু' থেকে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল আর ফুরু' ও মদীনার মধ্যকার দূরত্ব হল, ৯৬ মাইল।

আল্লামা ইবনে ইসহাকের মতে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ ৬ষ্ঠ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে তবে মূসা বিন উকবার মতে এ যুদ্ধ ৪র্থ হিজরী সনে হয়েছিল আর ওয়াকদীর ভাষ্য মতে, এই যুদ্ধ ৫ম হিজরী সনের শাবান মাসে হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এটিকে ৫ম হিজরী সনের যুদ্ধই লিখেছেন। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে যে, বনু মুস্তালিক গোত্র মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করেছে, এ প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) ৫ম হিজরী সনের শাবান মাসে তাদের উদ্দেশ্যে সাতশ' সাহাবী সঙ্গে নিয়ে অগ্রাভিযান করেন। মহানবী (সা.) মুহাজিরদের পতাকা হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে অর্পণ করেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি মুহাজিরদের পতাকা আম্মার বিন ইয়াসেরকে প্রদান করেন আর আনসারদের পতাকা হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র হাতে তুলে দেন।

ইফকের ঘটনা ঃ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ হল, বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.)'র বিরুদ্ধে মুনাফিকদের পক্ষ থেকে অপবাদ আরোপ করা হয়। এ ঘটনাটি ইতিহাসে ইফকের ঘটনা নামে পরিচিত। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত রয়েছে। যদিও এই রেওয়ায়েতটি পূর্বেও এক সাহাবীর স্মৃতিচারণে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণের প্রেক্ষাপটেও এটি এখানে বর্ণনা করা আবশ্যক।

মহানবী (সা.) যখন কোন সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সংকল্প করতেন তখন তিনি স্বীয় স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে এর উল্লেখ রয়েছে। লটারিতে যার নাম উঠতো তাকে তিনি (সা.) নিজের সফর-সঙ্গী হিসাবে নিয়ে যেতেন। তিনি (সা.) একটি যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে আমাদের মধ্যে লটারি করেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর এই লটারিতে আমার নাম উঠে। আমি তাঁর (সা.) সাথে যাই। এটি পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। তিনি (রা.) বলেন, আমাকে হাওদার ভেতরে সওয়ারীতে বা বাহণে উঠানো হতো, আবার হাওদায় থাকা অবস্থায়ই নামানো হতো। এভাবেই আমরা সফর করতে থাকি। অবশেষে মহানবী (সা.) এই যুদ্ধ শেষ করে যখন প্রত্যাবর্তন করেন আর আমরা মদীনার নিকটে পৌঁছে যাই তখন একরাতে তিনি (সা.) সেখান থেকে যাত্রার ঘোষণা প্রদান করেন। উক্ত ঘোষণা দেয়ার সময় আমি উঠে দাঁড়াই সেনাদলকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাই এবং নিজের প্রয়োজন সেরে হাওদায় ফিরে আসি, এরইমধ্যে আমি আমার গলায় হাত দিয়ে দেখি, আযফারের (ইয়েমেনী) মূল্যবান মনিমুক্তার তৈরি আমার হার ছিঁড়ে পড়ে গেছে। যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, তখন আমি (আমার হারের সন্ধানে) আবার ফিরে যাই এবং হার খুঁজতে খুঁজতে আমার দেরী হয়ে যায়। এদিকে যারা বাহন ও হাওদা উঠিয়ে দিত তারা আসে এবং হাওদা তুলে তারা তা সেই উটের পিঠে রেখে দেয় যাতে আমি বসতাম। তিনি (রা.) বলেন, তারা মনে করেছে, আমি হাওদাতেই আছি, কেননা তখনকার মেয়েরা হালকা-পাতলা হতো,

মোটাসোটা হতো না আর তিনি খুব কম খাবার খেতেন। যাহোক, হাওদা তুলতে গিয়ে এর ভার তাদের নিকট অস্বাভাবিক মনে হয় নি। তারা সেটি তুলে– সেসময় আমি অল্প-বয়স্কা মেয়ে ছিলাম। তারা হাওদা তুলে উট হাঁকিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। এদিকে সেনাদল চলে যাবার পর আমি আমার হার খুঁজে পাই। আমি তাদের শিবিরে ফিরে এসে দেখি, সেখানে কেউ নেই। এরপর যে তাঁবুতে আমি ছিলাম সেই তাঁবুতে যাই। আমি ভাবলাম, আমাকে না পেয়ে তারা আবার এখানে ফিরে আসবে। বসে থাকতে থাকতে আমার চোখ লেগে যায় আর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সাফওয়ান বিন মুআত্তাল সুলামী যাকওয়ানী সেনাদলের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সকালে আমার তাঁবুতে আসেন এবং একজন ঘুমন্ত মানুষকে দেখতে পেয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসেন। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তার ইন্না লিল্লাহ্ পড়ার শব্দে আমি জেগে উঠি। তিনি উটের পা মুড়িয়ে বসালে আমি উটে চড়ে বসি। আর তিনি আমাকে নিয়ে বাহন হাঁকিয়ে যাত্রা করেন। সেনাদল ঠিক দুপুরে যখন বিশ্রাম করছিল, তখন আমরা সেনাদলের কাছে গিয়ে পৌঁছি। অতঃপর যার ধ্বংস হবার ছিল সে ধ্বংস হল। আর এই মিথ্যা অপবাদের প্রধান হোতা ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল। (এরপর) আমরা মদীনায় পৌঁছি আর সেখানে আমি একমাস অসুস্থ থাকি। এদিকে কতক লোক অপবাদ রটনাকারীদের কথার চর্চা করতে থাকে। আমার অসুস্থতার সময় যে বিষয়টি আমাকে অস্থির করে তুলত তা হল মহানবী (সা.)-এর সেই স্নেহ আমি পেতাম না যা আমি আমার অসুস্থতার সময় সচরাচর অনুভব করতাম। তিনি শুধু ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বলতেন, কেমন আছ? আমি এই ঘটনার অর্থাৎ, ইফকের ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানতাম না। অবশেষে আমি যখন দুর্বল হয়ে পড়ি তখন (একরাতে) আমি ও উম্মে মিসতাহ্ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার স্থান মানাসের দিকে যাই। আমরা কেবল রাতেই সেদিকে যেতাম। আমরা রাতের অপেক্ষা করতাম আর এটি ছিল আমাদের ঘরগুলোর নিকটবর্তী স্থানে টয়লেট বা শৌচালয় বানানোর পূর্বেকার কথা। সে সময় ঘরে টয়লেট থাকতো না। যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, এর পূর্বে আমাদের অবস্থা প্রথম যুগের আরবদের মতই ছিল যারা জঙ্গলে কিংবা বাইরে গিয়ে প্রয়োজন সারতো। আমি এবং উম্মে মিসতাহ্ বিনতে আবু রুহম দু'জনই যাই। আমরা হাঁটছিলাম আর সে তার ওড়নায় পেঁচিয়ে পড়ে যায় আর বলে, মিসতাহ্ ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তাকে বললাম, তুমি খুবই খারাপ কথা বলেছ। তুমি কি এমন ব্যক্তিকে মন্দ বলছ যে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে?

সে বলল, হে অবলা মেয়ে, তুমি কি জান না লোকেরা কী বলাবলি করছে? এরপর সে আমাকে ইফকের ঘটনা বর্ণনা করে। এতে আমার অসুস্থতা আরো বৃদ্ধি পায়। এরপর যখন আমি আমার ঘরে ফিরে আসি তখন মহানবী (সা.) আমার কাছে আসেন এরপর তিনি আমাকে সালাম দিয়ে বলেন, তুমি কেমন আছ? আমি নিবেদন করি আপনি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাবার অনুমতি দিন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি আমার পিতা-মাতার কাছে চলে যেতে পারি। আমি তখন তাদের উভয়ের তথা পিতামাতার কাছ থেকে এ বিষয়ের সত্যাসত্য জানতে চাচ্ছিলাম। মহানবী (সা.) আমাকে অনুমতি প্রদান করেন। আমি আমার পিতা-মাতার কাছে চলে আসি আর আমি মাকে বলি, লোকজন এসব কী বলাবলি করছে? তিনি বলেন, হে আমার কন্যা! এ ব্যাপারে চিন্তা করে নিজেকে কষ্ট দিও না। আল্লাহর কসম! কোন পুরুষের সুন্দরী স্ত্রী যাকে সে ভালোবাসে আর তার যদি সতীনও থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে কথা বলবে না– এমনটি খুব কমই ঘটে।

আমি বলি সুবহানাল্লাহ! মানুষ এমন বিষয় ছড়াচ্ছে! হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি সেই পুরো রাত কেঁদে কেঁদে অতিবাহিত করি; এমনকি সকাল হয়ে গেলেও আমার অশ্রুধারা বন্ধ হয় নি আর আমার আদৌ ঘুম আসে নি। সকাল হলে মহানবী (সা.) হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.) ও হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে ডেকে পাঠান। ওহী হতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি (সা.) তাঁর স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাদের পরামর্শ চান। হযরত উসামা (রা.) যতদূর জানতেন সে মোতাবেক তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)'র সম্পর্ক কেমন বা হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কেও তিনি জানতেন যে, তিনি অত্যন্ত পূত-পবিত্র নারী ছিলেন তাই তিনি সে অনুসারেই পরামর্শ প্রদান করেন। যাহোক, হযরত উসামা (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি আপনার সহধর্মিণী আর আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাঁর ব্যাপারে পুণ্য ছাড়া আর কিছুই জানি না। আলী বিন আবী তালিব (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্ তা'লা আপনার জন্য কোন অভাব বা সংকট রাখেন নি। এ ছাড়া আরো অনেক নারী আছেন। ঐ দাসীকে জিজ্ঞাসা করুন সে আপনাকে সত্য বলে দিবে। এতে তিনি (সা.) বারীরাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, হে বারীরা! তুমি কী তার মাঝে এমন কিছু দেখেছ যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করতে পারে? বারীরা বলে, না। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন আমি তাঁর মাঝে এ ছাড়া আর কিছুই দেখি নি যেটিকে আমি দোষ বলতে পারি অর্থাৎ তিনি কম বয়সী একটি মেয়ে, মাখানো আটা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েন আর ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলে। মহানবী (সা.) সেদিনই দণ্ডায়মান হয়ে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করেন আর বলেন, কে আমাকে এই ব্যক্তি থেকে নিষ্কৃতি দিবে, আমার পরিবার সম্পর্কে তার দেয়া কষ্ট আমাকে জর্জরিত করেছে। আল্লাহর কসম! আমার পরিবারের ব্যাপারে আমি পুণ্য ছাড়া আর কিছুই জানি না। লোকজন এমন ব্যক্তির কথা বলছে যার ব্যাপারে পুণ্য ছাড়া আর অন্য কিছুই আমার জানা নাই। আমার ঘরে সে কেবল আমার সাথেই আসতো। হযরত সা'দ বিন মুয়া'য (রা.) দাঁড়িয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! খোদার কসম এ ব্যাপারে আমি আপনাকে নিষ্কৃতি দিব। যদি সে অওস গোত্রের হয় তবে আমরা তার শিরোচ্ছেদ করবো। আর সে যদি আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের মধ্যে হতে হয় তবে আপনি আমাদের নির্দেশ দিবেন আমরা আপনার নির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা নেব। এতে খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন উবাদা দণ্ডায়মান হন। ইতিপূর্বে তিনি ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব তাকে প্ররোচিত করে তোলে। তিনি বলেন, তুমি ভুল বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তাকে মারতে পারবে না আর তুমি তাকে হত্যার ক্ষমতাও রাখ না। অর্থাৎ গোত্রে-গোত্রে বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। তখন হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের দাঁড়িয়ে বলেন: তুমি ভুল বলছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাকে অবশ্যই হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষে কথা বলছ। এতে অওস এবং খাযরাজ উভয় গোত্র উত্তেজিত হয়ে উঠে, এমনকি তারা লড়াইয়ের জন্যও প্রস্তুত হয়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি (সা.) নীচে নেমে আসেন। তাদেরকে শান্ত করেন। অবশেষে তারা নীরব হয়ে যায় এবং তিনি নিজেও নিশ্চুপ হয়ে যান। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি সারাদিন ক্রন্দনরত ছিলাম। এখন তিনি এই ঘটনাও (অর্থাৎ দু'গোত্রের বিতণ্ডা সম্পর্কে) জানতে পেরেছেন, কিন্তু আসল কথা হল, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যা কিছু হচ্ছিল তা তো হচ্ছিলই, কিন্তু আমি সারাদিন কাঁদতে থাকি। আমার কান্না থামে নি আর আমার ঘুমও

আসে নি। আমার পিতামাতা আমার কাছে আসেন। আমি দু'রাত এবং এক দিন (অনবরত) ক্রন্দনরত ছিলাম। এমনকি আমি ভাবলাম এই ক্রন্দন আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দিবে। তারা উভয়ে, {অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.)'র পিতামাতা} আমার কাছে বসা ছিলেন আর আমি ক্রন্দনরতা ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা ভেতরে আসার অনুমতি চায় আর আমি তাকে অনুমতি প্রদান করি। সে বসে এবং আমার সাথে ক্রন্দন আরম্ভ করে। আমাদের এই অবস্থায় মহানবী (সা.) আগমন করেন এবং বসে পড়েন। যখন থেকে আমার সম্পর্কে অপবাদ রটানো হয়েছে আর যা কিছুই রটানো হয়েছে, তিনি (সা.) আমার পাশে বসেন নি আর এক মাস পর্যন্ত তিনি এভাবেই ছিলেন। আমার এই বিষয় সম্পর্কে তাঁর কাছে কোন ওহী অবতীর্ণ হয় নি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি (সা.) কলেমা শাহাদত পাঠ করেন। এরপর বলেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এই কথা পৌঁছেছে। যদি তুমি নির্দোষ হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তোমাকে দায়মুক্ত করবেন। আর যদি তোমার দ্বারা কোন দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর সমীপে তওবা কর, কেননা বান্দা যখন নিজের পাপ স্বীকার করে আর এরপর তওবা করে তখন আল্লাহ্ তা'লাও তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান করেন। মহানবী (সা.) যখন নিজের কথা শেষ করেন তখন আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি আমি আর এক বিন্দু অশ্রুও অনুভব করি নি। তখন আমি আমার পিতা অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলি, আমার পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর কথার উত্তর দিন। তিনি বলেন, খোদার কসম! আমি জানি না যে, আমি মহানবী (সা.)-কে কী বলব। এরপর আমি আমার মাকে বললাম, আপনি আমার পক্ষ থেকে মহানবী (রা.)-কে তিনি যা বলেছেন তার উত্তর দিন। তিনি বলেন, খোদার কসম! আমি জানি না যে, আমি মহানবী (সা.)-কে কী বলব। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি তখন একজন স্বল্পবয়স্কা মেয়ে ছিলাম। খুব একটা কুরআনও জানতাম না। আমি বললাম, খোদার কসম! আমি জানতে পেরেছি যে, আপনারা তা শুনেছেন যা নিয়ে মানুষ কথা বলছে। আর আপনাদের হৃদয়ে তা স্থান করে নিয়েছে এবং আপনারা তা সঠিক ধরে নিয়েছেন। আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে, আমি নির্দোষ, আর আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, আমি বাস্তবেই নির্দোষ, (তবুও) আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি আপনাদের কাছে কোন কথা স্বীকার করে নেই, আর আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, আমি দায়মুক্ত, তাহলে আপনারা আমাকে সে ক্ষেত্রে সত্য মনে করবেন। খোদার কসম! আমি নিজের এবং আপনাদের জন্য ইউসুফের পিতার উদাহরণ ব্যতীত কোন উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছি না, যখন তিনি বলেছিলেন, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (সূরা ইউসুফ: ১৯)। অর্থাৎ, এখন উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করাই আমার জন্য শ্রেয়। আর তোমরা যে কথা বলছ– তার প্রতিকারের জন্য আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা যেতে পারে এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা হবে। এরপর আমি আমার বিছানায় মুখ ফিরিয়ে নেই আর আমার আশা ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোষমুক্তির বিষয়টি প্রকাশ করে দিবেন। কিন্তু খোদার কসম! আমার এই ধারণা ছিল না যে, তিনি আমার সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ করবেন। আমার ধারণামতে আমি এর চেয়ে অনেক অযোগ্য ছিলাম যে, আমার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কোন কথা বলা হবে। কিন্তু আমার আশা ছিল, মহানবী (সা.) ঘুমের মাঝে এমর্মে কোন স্বপ্ন দেখবেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করছেন। খোদার কসম! তিনি (সা.) তাঁর বসার স্থান থেকে পৃথক হননি, আর ঘরে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকেও কেউ বাইরে যায় নি, এমতাবস্থায়

তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় আর তাঁর (সা.) সেই বিশেষ কষ্টের অবস্থা আরম্ভ হয় যা ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর হতো। এমনকি শীতের দিনে-ও তাঁর (সা.) (শরীর) থেকে মুক্তোর মতো (বিন্দু বিন্দু) ঘাম গড়িয়ে পড়ত। মহানবী (সা.)-এর এই অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি (সা.) মুচকি হাসছিলেন আর সর্বপ্রথম যে কথাটি তিনি আমাকে বলেছিলেন তা হলো, হে আয়েশা! আল্লাহ্‌র প্রশংসা কর, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তোমার নির্দোষ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আর (এ কথা শুনে) আমার মা আমাকে বলেন, ওঠো, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে যাও। (জবাবে) আমি বললাম, না খোদার কসম, আমি তাঁর (সা.) কাছে যাব না এবং আল্লাহ্ ছাড়া কারো প্রশংসা করব না। তখন আল্লাহ্ তা'লা আয়াত إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ (সূরা আন্ নূর: ১২) অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা এক বড় মিথ্যা রটনা করেছিল তারা তোমাদেরই এক দল। যখন আল্লাহ্ তা'লা আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে (এই আয়াত) অবতীর্ণ করেন তখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আয়েশা (রা.) সম্পর্কে সে {অর্থাৎ মিসতাহ্ (রা.)} যে অপবাদ রটিয়েছে এর পর আমি মিসতাহ্-র খরচ বহন করব না। তিনি (রা.) মিসতাহ্ বিন উসাসা'র নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তার খরচ বহন করতেন। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'লা আয়াত وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (সূরা আন্ নূর: ২৩) অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ, আর তোমাদের মাঝে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারীরা যেন আত্মীয়স্বজন, অভাবী এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদের কিছুই দিবে না বলে কসম না খায়। তাদের উচিত তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও বারবার কৃপাকারী।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, কেন নয়! আমি অবশ্যই পছন্দ করি আল্লাহ্ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। অতঃপর তিনি (রা.) মিসতাহ্‌কে পুনরায় আর্থিক সাহায্য প্রদান করা আরম্ভ করেন। অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত মিসতাহ্ (রা.)-কে যে আর্থিক সাহায্য করতেন তা পুনরায় প্রদান করা আরম্ভ করেন। {হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,} রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর কাছে আমার বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমার সম্পর্কে তিনি (সা.) হযরত যয়নব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করতেন। তিনি (সা.) হযরত যয়নবকে বলেন, হে যয়নব! তুমি (আয়েশা সম্পর্কে) কী জান? তখন তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আমার কান এবং চোখকে সংরক্ষণ করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার মাঝে ভালো ছাড়া আর কিছুই দেখি নি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, ইনিই সেই যয়নব ছিলেন যিনি {রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্ত্রীদের মাঝে} আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা (তার) পুণ্যের কারণে তাকে রক্ষা করেছেন। এটি সহীহ্ বুখারীর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত।

হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদা তা'লা যে বিষয়টি স্বীয় বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত রেখেছেন তা হলো, তিনি শাস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণীকে তওবা ও ইস্তেগফার এবং দোয়া ও সদকার ফলে টলিয়ে দেন। অনুরূপভাবে মানুষকে-ও তিনি সেই একই স্বভাব শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন, কুরআন শরীফ ও হাদীস থেকে এটি প্রমাণিত যে, হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে মুনাফেকরা কেবলমাত্র নোংরামি করে সত্যপরিপন্থী যে অপবাদ আরোপ করেছিল, এই গুজবে কতিপয় সরল প্রকৃতির সাহাবী (রা.)-ও জড়িয়ে পড়েন। একজন সাহাবী এমন

ছিলেন যে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘরে দু-বেলা খাবার খেতেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার এই অপরাধের কারণে শপথ করেছিলেন এবং শাস্তি স্বরূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে, তার এই অনুচিত কাজের শাস্তি স্বরূপ আমি তাকে আর কখনো খাবার দেব না। তখন এই আয়াত وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (সূরা আন্ নূরঃ ২৩) অবতীর্ণ হয় আর হযরত আবু বকর নিজের সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন এবং তাকে খাবার খাওয়ানোর রীতি পুনর্বহাল করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর ভিত্তিতেই এ বিষয়টি ইসলামী নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত যে, যদি শাস্তি দেয়ার কোন অঙ্গীকার করা হয়, তবে তা ভঙ্গ করা উত্তম চরিত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ তার কর্মচারীর বিষয়ে শপথ করে একথা বলে যে, আমি অবশ্যই তাকে পঞ্চাশবার জুতোপেটা করব, তবে তার তওবা ও অনুশোচনার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া ইসলামের রীতি, যেন এভাবে **'তাখাল্লুক বিআখলাকিল্লাহ্'** (নিজের মাঝে আল্লাহ্‌র গুণ ও বৈশিষ্ট্য অবলম্বন) করা হয়। কিন্তু ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) ভঙ্গ করা বৈধ নয়। ওয়াদা ভঙ্গ করলে জিজ্ঞাসিত হতে হবে, শাস্তিপ্রদান মূলক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে নয়।

ওয়াদা এবং ওয়া'ঈদ কী– সেটি একটি ভিন্ন প্রসঙ্গ; পূর্বেও একবার এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যাহোক, এবার আলোচনা হবে আহযাবের যুদ্ধ সম্পর্কে, যা ৫ম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। মক্কার কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে এটি ছিল তৃতীয় বড় যুদ্ধ, যাকে পরিখার যুদ্ধও বলা হয়। এই যুদ্ধ ৫ম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। যেহেতু এই যুদ্ধে কুরাইশ, খায়বারের ইহুদি এবং আরও অনেক গোত্র সংঘবদ্ধ হয়ে মদিনা মুনাওয়ারার ওপর আক্রমণ করেছিল, সেজন্য কুরআন শরীফে উল্লিখিত নাম তথা 'আহযাব' নামেও এই যুদ্ধ পরিচিত। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন ইহুদি গোত্র বনু নাযীরকে নির্বাসিত করেন, তখন তারা খায়বারে চলে যায়। তাদের সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত কিছু ব্যক্তি মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। তারা কুরাইশদের একত্রিত করে এবং তাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উস্কানি দেয়। তারা কুরাইশদের সাথে চুক্তি করে এবং সবাই তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একমত হয় আর এর জন্য তারা একটি সময় নির্ধারণ করে নেয়। বনু নাযীর গোত্রের লোকেরা কুরাইশদের কাছ থেকে বেরিয়ে গাতফান ও সুলায়েম গোত্রের কাছে যায় এবং তাদের সাথেও অনুরূপ চুক্তি করে আর এরপর তারা তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। কুরাইশরা প্রস্তুতি নেয়; তারা বিভিন্ন গোত্র ও তাদের মিত্র আরবদের একত্রিত করে, যাদের সংখ্যা চার হাজারে গিয়ে ঠেকে। তাদের নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান বিন হারব। পথে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও এই সৈন্যবাহিনীর সাথে যুক্ত হতে থাকে, এভাবে এই সৈন্যবাহিনীর মোট সংখ্যা দশ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কা থেকে তাদের যাত্রা করার সংবাদ পান তখন তিনি (সা.) সাহাবীদের ডাকেন, তাদেরকে শত্রুর বিষয়ে অবগত করেন এবং এই বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন হযরত সালমান ফার্সী পরিখা খননের পরামর্শ দেন যা মুসলমানদের পছন্দ হয়। মহানবী (সা.)-এর যুগে মদিনার উত্তর দিক উন্মুক্ত ছিল, অবশিষ্ট তিন দিকে বাড়িঘর ও খেজুর-বাগান ছিল, যেদিক দিয়ে শত্রুরা প্রবেশ করতে পারতো না। তাই উন্মুক্ত দিকে পরিখা খনন করে শহরের প্রতিরক্ষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মহানবী (সা.) তিন হাজার মুসলমানকে সাথে নিয়ে পরিখা খনন আরম্ভ করেন। মহানবী (সা.) অন্যান্য মুসলমানদের সাথে পরিখা খননের কাজ করছিলেন যেন তাদের মনোবল দৃঢ়

হয়। মোট ছয়দিনে এই পরিখা খনন করা হয়। এই পরিখার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ছয় হাজার গজ বা সাড়ে তিন মাইল। হযরত আবু বকর, মহানবী (সা.)-এর সাথে সাথে ছিলেন। পরিখা খননের সময় হযরত আবু বকর নিজের জামায় করে মাটি উঠাতেন এবং পরিখা খননের কাজেও তিনি অন্যান্য সাহাবীদের সাথে একত্রে কাজ করেন, যেন নির্ধারিত সময়ের ভেতর দ্রুততম সময়ে পরিখা খননের কাজ সম্পূর্ণ হয়। কোন মুসলমান-ই পরিখা খননের কাজ থেকে পিছিয়ে থাকেনি। আর হযরত আবু বকর ও হযরত উমর যখন ঝুড়ি খুঁজে পেতেন না, তখন কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য নিজেদের জামায় করে মাটি তুলে অন্যত্র সরাতেন। আর তারা দু'জন কোন কাজ বা সফরে কিংবা অন্য সময়ে পরস্পর থেকে পৃথক হতেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) পরিখা খননে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন; কখনো তিনি কোদাল চালাতেন, কখনো বেলচা দিয়ে মাটি জড়ো করতেন এবং কখনো টুকরিতে মাটি তুলতেন। একদিন তিনি (সা.) অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটু বসেন এবং বাঁদিকে একটি পাথরে হেলান দেন আর মহানবীর ঘুম পায়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর মাথার দিকে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে বারণ করেন যাতে তাঁর ঘুমের ব্যঘাত ঘটে। কুরাইশ এবং তাদের মিত্র বাহিনীর ১০ হাজার যোদ্ধা মদিনার মুসলমানদের যখন অবরোধ করে তখন সেই অবরোধকালে হযরত আবু বকর (রা.) মুসলমানদের একাংশের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পরবর্তীতে সেই জায়গা, যেখানে হযরত আবু বকর (রা.) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, যেটি মসজিদে সিদ্দীক নামে প্রসিদ্ধ। আগামীতেও ইনশাআল্লাহ্ উক্ত স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে।

এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই যাদের মাঝে প্রথমে রয়েছেন মুকাররমা মোবারাকা বেগম সাহেবা, যিনি ছিলেন মুখতার আহমদ গোন্দল সাহেবের সহধর্মিণী। ১১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে তিনি ৯৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ গোন্দল সাহেবের পুত্রবধূ ছিলেন। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে জামা'তের সেবা করতেন। তিনি নিজ গ্রাম চক নিরানব্বই উত্তর-এর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদরও ছিলেন। নিয়মিত নামায, রোযা পালনকারী এবং দরিদ্র প্রতিপালনকারী নিষ্ঠাবান মহিলা ছিলেন। সারা জীবন ছোটদের এবং বড়দের পবিত্র কুরআন পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুমা ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে পাঁচজন পুত্রসন্তান এবং তিনজন কন্যাসন্তান রেখে গেছেন। সিয়েরা লিওনের মুরব্বী ইফতেখার আহমদ গোন্দল সাহেব তার পুত্র এবং তিনি মুরব্বী ফাওয়াদ আহমদ সাহেবের দাদী ছিলেন। এছাড়া তার বংশে পৌত্র এবং পৌত্রীদের মাঝে আরও অনেকে মুরব্বী এবং ওয়াকফে জিন্দেগীও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তার দোয়া তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে কবুল করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ মীর আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবের যিনি ১২ এবং ১৩ জানুয়ারির মধ্যবর্তী রাতে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমের বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার বড়দাদা মীর আহমদ দ্বীন সাহেবের মাধ্যমে, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর খিলাফতকালে ১৯১১ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ বংশে একাই আহমদী ছিলেন। একইভাবে তার নানা বাড়ির দিক থেকে তার নানা শেখ আল্লাহ্ বখ্‌শ সাহেব অফ বান্নু সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের

সূচনা হয়। আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবের দাদার নাম ছিল আব্দুল করীম। তিনি তবলীগের ক্ষেত্রে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাই তার দাদা পেশাওয়ারে মৌলভী আব্দুল করীম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনেক পড়াশোনা করতেন। তিনি নিজস্ব লাইব্রেরিও বানিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে যখন সংসদে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল উপস্থিত হচ্ছিল তখন অনেক বিরল বইয়ের প্রয়োজন পড়ে যেগুলো তার পাঠাগার থেকে হস্তগত হয়। তাঁর বোনজামাই এই রেওয়ায়েত পাঠিয়েছেন। ২০২০ সালের ০৯ সেপ্টেম্বর রসূল অবমাননার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কারণে ২৯৫সি ধারায় মীর আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবের পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা হয়। ফলে মোল্লা, মৌলভী এবং অন্যান্য লোকেরা তাদের বাড়ি অবরোধ করে রাখে। পুলিশ তাকে স্বপরিবারে কোনভাবে ঘর থেকে বের করে নিয়ে রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছে দেয়। কিছুদিন পর রাওয়ালপিণ্ডিতে তাদের ঘরে রাতে অতর্কিতে পুলিশ এসে তার পুত্র আব্দুল মজিদ সাহেবকে গ্রেফতার করে। আল্লাহ্ তা'লা মীর আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবকে দুই পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান দান করেছিলেন। তার এক পুত্র আব্দুল মজিদ সাহেব, যার বিষয়ে একটু আগে উল্লেখ করা হলো, এখন আসীরে রাহে মাওলা হিসেবে জেলে বন্দি অবস্থায় আছেন। নিজ পিতার মৃত্যুতেও তিনি আসতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার আত্মীয়দের ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন আর তার যে পুত্র এখনও বন্দি অবস্থায় আছেন, যার বয়স সম্ভবত ২০ বছর, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আশু মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণটি হলো যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী মুকাররম সৈয়্যদ ওয়াকার আহমদ সাহেবের; যিনি গত ১৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ৫৮ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাঁর সহধর্মিণী হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের প্রদৌহিত্রী অর্থাৎ তাঁর দৌহিত্রের কন্যা এবং হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের পৌত্রির কন্যা হন। সেই সূত্রে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশধর। শাহ্ সাহেবের বংশে তার বিয়ে হয়। তাঁর সহধর্মিণী শাযিয়া খান বলেন, বিয়ের এই সম্বন্ধের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমাকে দোয়া করতে বলেন। দোয়া করে আমি যখন সম্মতি প্রকাশ করি তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এই সম্বন্ধের সদয় অনুমতি প্রদান করেন। অর্থাৎ তিনি (রাহে.) এই সম্বন্ধ করিয়েছেন। তিনি (শাযিয়া খান) লিখেন, তেত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি আঙুল ধরে আমাকে পরিচালিত করেছেন। যাবতীয় চাহিদা ও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি ছিলেন একজন অতুলনীয় পিতা। নিজের জন্য কখনো কিছুই করেন নি এবং নিতান্ত অনাড়ম্বর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর মাঝে কোন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ছিল না আর যৎসামান্য থাকলেও তা পরিবার-পরিজনের জন্য জলাঞ্জলি দিতেন। তিনি বলেন, সেই দিনটি ছিল আমার জন্য সুন্দরতম দিন যেদিন জনৈক ব্যক্তিকে গর্ব করে তিনি বলেন– আমি মসজিদে যাই; আমার অঙ্গীকার পাঠ করি এবং আমার কাছে সেই অঙ্গীকার পূরণের চেয়ে অন্য কিছু বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই অঙ্গীকারের জন্য আমি সবকিছু ত্যাগ করতে পারি আর এটি নিছক কথার কথা নয় বরং আমি লক্ষ্য করেছি, (আমি জানি,) একটি কঠিনতম পরীক্ষার মুহূর্তেও তিনি এই অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন এবং ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন আর যা (অঙ্গীকার) রক্ষা করছিলেন তা পূর্ণ করেছেন এবং (এক্ষেত্রে) কোন ধরনের আত্মীয়তার পরোয়া করেন নি। খিলাফতের আনুগত্যের বাইরে কখনো পা রাখেন নি। তিনি বলেন, তিনি যা বুঝতেন না

তারও আনুগত্য করতেন, কেননা আমাদের কাজই হলো আনুগত্য করা। তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ প্রকৃতির ছিলেন আর তিনি সর্বদা আমাকেও এ ব্যাপারে নসীহত করতেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে তিনি কখনো শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নি। তাঁর পুত্র স্নেহের সৈয়্যদ আদেল আহমদ বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া কানাডা থেকে শাহেদ পাশ করে মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে আমার পিতা একজন অনাড়ম্বর ও নিষ্ঠাবান প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো নিজেকে নিয়ে ভাবেন নি বরং সর্বদা সহধর্মিণী ও সন্তানসন্ততির প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। ভালো কোন জিনিস নিজের জন্য ক্রয় করতেন না, বরং কয়েক বার স্মরণ করাতে হতো যে, নিজের জন্যও খরচ করুন। মুরব্বী সাহেবদের এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তার শ্বশুর মাহমুদ আহমদ খান সাহেব, যিনি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের দৌহিত্র এবং হযরত নওয়াব মুবারাকা বেগম সাহেবার পৌত্র, তিনি লিখেন, ওয়াকার অর্থাৎ তার জামাতা ছিলেন একজন অতি সচ্চরিত্রবান ও অতিথিপরায়ণ মানুষ। তিনি বলেন, যত অতিথিই আসুক না কেন আর তাদের সাথে আলাপচারিতায় যা কিছুই হোক না কেন, আমি কখনো তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেখি নি। তিনি আরো বলেন, আমার মনে আছে প্রথম দিকে তার পুত্র আদেলের উদাসীনতার কারণে সে তাকে বার বার শাসন করতো, কিন্তু আদেল যখন জীবন উৎসর্গ করে তখন তার সাথে ওয়াকারের ব্যবহার সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। অতঃপর এই সন্তানই তার সবচেয়ে প্রিয় হয়ে যায় এবং সে তাকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো।

আবুধাবি জামা'তের সাবেক আমীর মুনির আহমদ সাহেব লিখেন, চাকরিসূত্রে ওয়াকার সাহেব স্বপরিবারে আবুধাবিতে অবস্থান করতেন। এখানে অবস্থানকালে তার সাথে পারিবারিক সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি একজন পেশাজীবি ব্যাংকার ছিলেন। অনাড়ম্বর প্রকৃতি ছিল তার বিশেষ চারিত্রিক গুণ। জামা'ত ও ব্যবস্থাপনার প্রতি নিবিড় সম্পৃক্ততা বজায় রাখতেন। খিলাফতের জন্য সীমাহীন প্রেম ও আনুগত্যের প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিলেন। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পূর্বে তার বাড়িটি জামা'তের প্রয়োজনে অত্যন্ত হাসিমুখে দিয়ে রাখেন যা জুমুআ এবং বিভিন্ন সভার জন্য কাজে আসে। জামা'তের ইন্টার্নাল অডিটর (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক) হিসেবেও তিনি কাজ করার তৌফিক লাভ করেন। অনুরূপভাবে সৈয়্যদ হাশেম আকবর সাহেব লিখেন, আমি তার সাথে কাজ করেছি। আমি তাকে সদা মিশুক ও মানবসেবার স্পৃহায় সমৃদ্ধ পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন আর তার সন্তানদেরও সৎকর্ম করার তৌফিক দান করুন এবং সন্তানদের জন্য তার দোয়া কবুল করুন। নামাযের পর আমি তাদের সবার (গায়েবানা) জানাযার নামায পড়াব, ইনশাআল্লাহ।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)